Journal of Cultural Research Studies, Vol-1 Issue-1(2022), p. 23-30
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

বেলপুকুরের কালিকা আরাধনা:একটি লৌকিক ইতিবৃত্ত

দেবাদৃতা ভট্টাচার্য

নবদ্বীপের গঙ্গার দিকে থেকে যদি খানিক পূর্বদিকে যাওয়া যায়,তাহলে পাওয়া যাবে এক বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম;বেলপুকুর।যার আদি নাম বিল্বপুস্করিণী।নবদ্বীপের ন'টি দ্বীপের সীমান্ত দ্বীপ হিসাবে পরিগণিত হয় এই গ্রামটি।আর পাঁচটা গ্রামের মতোই শান্ত জনজীবন,বয়ে চলা জলঙ্গীর স্রোতের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে আনুমানিক ৪০০ বছরের ঐতিহ্য এবং নিয়মে বাঁধা প্রতি ঘরে ঘরে কালীপুজোর এক রীতি।এছাড়া নবদ্বীপ শক্তি সাধনা ও তার সঙ্গে তন্ত্র সাধনার বৃহত্তর প্রসার কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত ছিল। শুদ্ধাচার শক্তি সাধনার পথপ্রদর্শক রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও তাঁর পিতা মহেশ্বর গৌড়াচার্য। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ১৭০টি তন্ত্র ও উপতন্ত্রের সার সংগ্রহ করেই রচনা করেছিলেন বৃহৎতন্ত্রসার। যেকারণে সাধারণের হৃদয় থেকে তান্ত্রিক, কাপালিকদের সম্পর্কে কয়েক শতাব্দী ধরে জমে থাকা ভীতি ও ঘৃণা দূর হতে থাকে এবং শক্তি আরাধনার প্রতি মানুষ ক্রমশ আকৃষ্ট হতে থাকে।(১) ক্ষুদ্র পল্লীতে একসময় বহু প্রগাঢ় পন্ডিতদের আবাসস্থান ছিল। নব্য-ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রচুর টোল ও চতুস্পাঠী নির্মিত হয়েছিল। সেকারণেই বলা যেতে পারে যে, নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের পরেই এই বিল্বপুষ্করিণী শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার হৃদপিন্ড হিসেবে দিগন্ত বিস্তৃত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিরত্ন ও পন্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ তর্করত্ন প্রমুখ স্বনামধন্য পন্ডিতদের নাম পাওয়া যায়। (২) মহাবংশে উল্লেখিত রত্নগর্ভের বংশধর পন্ডিত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নদীয়ার শাসক রুদ্র রায়ের বৃত্তিভোগী ছিলেন বলে কথিত আছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী পন্ডিত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য একদা এক পুকুর তীরে বিল্ববৃক্ষতলে সাধনায মগ্ন হয়েছিলেন এবং সিদ্ধি লাভ করেছিলেন বলে এই গ্রামের নামকরণ হয়েছিল বিল্বপুষ্করিণী যার প্রচলিতে নাম বেলপুকুর।(3)

বেলপুকুর গ্রাম আর পাঁচটা গ্রামের চেয়ে আলাদা তার ইতিহাস এবং নিজস্ব সংস্কৃতির কারণে। শ্রীচৈতন্যদেবের মাতুল(মতান্তরে মাতামহ),শ্রী নীলাম্বর চক্রবর্তীর বাসস্থান ছিল এই গ্রামে এবং শচীমাতার জন্মস্থানও এই গ্রাম।বেলপুকুরের অন্যতম প্রসিদ্ধ মদনগোপাল মন্দিরের দারুমূর্তিটি নীলাম্বর চক্রবর্তীরই প্রতিষ্ঠিত বলে জানা যায়। বিশ্বের বৈষ্ণব ভক্তকূলের মধ্যে নবদ্বীপ,শান্তিপুর এবং বেলপুকুরের স্থানমাহাত্ম্য প্রবল।নবদ্বীপ মহামণ্ডল পরিক্রমার একটি

অন্যতম অংশ এই বেলপুকুর গ্রাম।১৯৭৮ সাল নাগাদ নীলাম্বর চক্রবর্তীর ভিটের কিছু অংশে খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে কিছু এমন জিনিস পাওয়া যায়, যেগুলির পুরাতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম।চন্দন কাঠের পুথিদান,কাঁসার কচ্ছপের আকৃতির শঙ্খদানি পাওয়া যায় এবং যেটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য,প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লিখিত একটি পুথিও পাওয়া যায়।বহু মানুষ এই পুথিটি পড়ার চেষ্টা করলেও,পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।বাংলা অক্ষরে লেখা থাকলেও এর অর্থ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি কারুর পক্ষেই।

বিল্বপুষ্করিণী বা বেলপুকুরের নামকরণ নিয়ে অনেকগুলি কিংবদন্তি প্রচলিত।কারুর মতে,বেলগাছে ঘেরা পুষ্করিণীর আধিপত্যের কারণে এই স্থানের নাম হয় বিল্বপুষ্করিণী,যা পরে বিবর্তিত হয়ে পরিণত হয়েছে আজকের বেলপুকুরে।আবার অপর এক মতানুযায়ী,জলঙ্গীর ধারে এক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল দুটি শিবলিঙ্গ,যাদের নাম ছিল যথাক্রমে বিল্ব ও পক্ষ। কোনো এক বর্ষার বানের সময় মন্দির সহ শিবলিঙ্গ দুটি ভেসে যায়। সেই বিল্ব ও পক্ষ নামের শিবলিঙ্গ দুটির স্মরণে নাম রাখা হয় বিল্বপক্ষ,পরবর্তীতে তা বিকৃত হতে হতে এসে পৌঁছয় বিল্বপুষ্করিণী তথা বেলপুকুরে।শোনা যায় আসামের মহাপুরুষীয়া ধর্মের অন্যতম এক বিশিষ্ট ধারক শ্রীমাধবদেব এসেছিলেন এই মদনগোপাল মন্দিরে।অনেকে বলেন,তিনি এসে নাকি এই স্থানের মাটি নিজের সিঁথিতে বুলিয়েছিলেন যার থেকে এইস্থানের নাম নাকি সীমন্ত দ্বীপ(সীমান্ত দ্বীপ নয়)।এই গ্রামের গঠনটাও বেশ অনন্য।গ্রামের দুপ্রান্তে রয়েছে কৈবর্ত্যপাড়া;যেখানকার বাসিন্দারা যথাক্রমে ঘোষ ও মালো পদবিপ্রাপ্ত।একসময়ে এরা গ্রামের রক্ষক হিসেবে কাজ করতো।বেলপুকুরের প্রতিটা পাড়ার নামে রয়েছে অনন্যতা।প্রত্যেকটা পাড়ার নাম বুঝিয়ে দেয় সমাজের কোন পদের মানুষ সেখানে থাকতেন।যেমন- চূড়ামণিপাড়া,বাচস্পতিপাড়া,তর্কালঙ্কার পাড়া, মুহুরীপাড়া, বিদ্যালঙ্কারপাড়া।সেইসময় বেলপুকুরের অধিকাংশ মানুষেরই জীবিকা ছিল টোল বা পাঠশালাতে শিক্ষাদান।শিক্ষাচর্চার এক অন্যতন পীঠস্থান ছিল এই গ্রাম। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে,যে সময় বাকি জায়গায় নারীশিক্ষার কোনোরকম প্রচলনই ছিল না,তখন কিন্তু এই গ্রামের প্রত্যেক নারী ছিলেন শিক্ষিত এবং সাক্ষর।বরাবরই নারীশিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বের চোখে দেখা হত এখানে।এক সময়ে বাচস্পতিপাড়ায় টেরাকোটার কাজ করা ১০৮টি শিব মন্দির ছিল।বর্তমানে সেগুলির ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নেই। জানা যায় এই প্রত্যেকটি মন্দিরের গায়েও ১০৮টি করে শিবের মূর্তি খোদাই করা ছিল। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগেও নাকি বনের মধ্যে বিভিন্ন আকারের বহু শিবলিঙ্গ পড়ে থাকতো। পরবর্তীতে কিছু শিবলিঙ্গ আশেপাশের কিছু

গ্রাম যেমন দোগাছি,তাতলা,ঈশ্বরীপুর এবং এই গ্রামের কয়েকটি দালানবিশিষ্ট মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। জানা যায় যে,যখন নদিয়ার রাজধানী শিবনিবাসে ছিল,তখন তৎকালীন নদীয়ারাজের নির্দেশে এই আটচালা টেরাকোটার মন্দিরগুলি নির্মিত হয়। প্রত্যেক বৈষ্ণবের কাছে এটি অন্যতম পীঠস্থান হলেও এই গ্রামের শতকরা ৯০ ভাগ লোকই শক্তির উপাসক। এর পিছনে রয়েছে এক ঐতিহাসিক কাহিনী।

সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে শ্রী কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য শুরু করলেন কালীপূজা।'আগম' পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন বলে 'আগমবাগীশ' উপাধি লাভ করেন এবং কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নামেই অধিক পরিচিতি লাভ করেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অনেক দিন আগে থেকেই নবদ্বীপ তন্ত্রচর্চার ক্ষেত্র হিসেবে সুনাম অর্জন করলেও একসময় তন্ত্রসাধনার বিকৃতি জনমানসে আতঙ্কের সৃষ্টি করলে উদারমনস্ক কৃষ্ণানন্দ এগিয়ে এলেন মার্জিত পথে তন্ত্রসাধনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনার ফসল শৈব,বৈষ্ণব,সৌর,গাণপত্য,শাক্ত সম্প্রদায়ের তন্ত্রের সার কথা দিয়ে সৃষ্ট "বৃহৎতন্ত্রসার"কে পৌঁছে দিলেন সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে।এর আগে কালীমাতার মূর্তির প্রচলন বা পূজা কোনোটাই প্রচলিত ছিল না।এই কালীমাতার মূর্তির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে ঘটনাটি শোনা যায়,তা খানিকটা এরকম-কালীমাতার মূর্তি তৈরির আকুতিতে কৃষ্ণানন্দ স্বপ্নাদেশ পেলেন,পরেরদিন প্রত্যুষে যে নারীকে সবার আগে তিনি দেখবেন-তার অনুকরণেই তৈরী হবে কালিকার মৃন্ময়ী মূর্তি।পরদিন ভোরে গঙ্গাস্নানে যেতে গিয়ে ঘুটে দিতে ব্যস্ত শ্যামবর্ণা,এলোকেশী এক দরিদ্র বধূ মাটির তাল নিয়ে চলেছেন,বেশবাস এবং কেশ অবিন্যস্ত। এহেন অবস্থায় কৃষ্ণানন্দকে দেখে লজ্জায় জিভ কাটলেন বধূটি।এর অনুকরণেই দক্ষিণাকালীর মূর্তি তৈরী করলেন তিনি।ঘরের মেয়ে হিসাবে মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করলেন দেবী কালিকাকে।দীপান্বিতা অমাবস্যাতে পূজিত আগমবাগীশের সেই কালীপূজা এবং পদ্ধতি এবার ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো গঙ্গার তীরবর্তী গ্রামগুলিতে।কিন্তু সবার মধ্যে ব্যতিক্রম হয়ে উঠলো এই গ্রামটি।বংশপরম্পরায় প্রচলিত কথন এবং ইতিহাসের সূত্র ধরে যদি জানতে চাওয়া হয় এই ব্যতিক্রমের প্রশ্নের উত্তর,তবে জানা যায় বেশ কিছু কথা।

আগমবাগীশের পূজা প্রচলনের প্রায় দেড়শো বছর পর,ঢাকার কনকসার গ্রাম থেকে বেলপুকুরে আসেন রামচন্দ্র ভট্টাচার্য নামে শক্তিসাধক।তখন রেউই থেকে কৃষ্ণনগর,এই নতুন

নামকরণ হয়েছে মাত্র-রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজা রুদ্র রায়;যিনি ছিলেন পরবর্তীকালের নামকরা নদীয়াশাসক কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রপিতামহ।বেলপুকুর বা তৎকালীন বিল্বপুষ্করিণী ছিল সেসময় তার অধীনে। তৎকালীন বৈষ্ণব আন্দোলন হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরম শাক্ত রুদ্র রায়ের ভ্রূকুটির কারণ। তার চিন্তা ছিল শ্রীচৈতন্যের মাতুলালয় গ্রামটিকে কি করে বাঁচাবেন এই আগ্রাসনের হাত থেকে। কপর্দকশূন্য রামচন্দ্র ভট্টাচার্য গিয়ে অনুনয় করলেন রাজাকে,যদি রাজা তার রাজ্যেও বিল্বপুষ্করিণী গ্রামটিতে তাঁকে থাকতে অনুমতি দেন।রুদ্র রায় রাজি হলেন এক শর্তে।তিনি শর্ত রাখলেন,যে রামচন্দ্র ঐ গ্রামে বসবাস করতে তখনই পারবেন যখন তিনি নিজে শক্তিসাধনা করবেন এবং গ্রামের বাকিদেরও সেই পথে চালনা করতে পারবেন। রামচন্দ্র হাতে চাঁদ পেলেন,গ্রামবাসীদের রাজি করাতেও বেশি বেগ পেতে হল না কারণ ততদিনে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রথম ভিতটুকু গড়ে দিয়ে গেছেন।আদ্যোপান্ত শক্তিসাধক রামচন্দ্র ছিলেন নিষ্ঠাবান অথচ গোঁড়ামিমুক্ত এক ব্রাহ্মণ,যিনি বদলে দিলেন একটা গোটা গ্রামের ভবিষ্যৎ,জায়গা করে দিলেন ব্যতিক্রমী ইতিহাসের পাতায়।সেই তখন থেকে আজও,এই একবিংশ শতকের দুইয়ের দশকেও পুরুষানুক্রমে একই নিয়মে,একই উপাচারে পুজো হয়ে আসছে এই গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে।রামচন্দ্রের পরিবার পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে ছড়িয়ে পড়ে পুরো গ্রামে এবং বর্তমান বাসিন্দাদের মধ্যে তার সরাসরি উত্তরসূরি পরিবার হিসেবে রয়েছে বড় বাড়ি,মেজো বাড়ি,সেজো বাড়ি,ন'বাড়ি,ছোট বাড়ি।

এদের মধ্যে ন'বাড়ির মাতৃআরাধনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।জানা যায় যে,রামচন্দ্রের সময়কার মহাশঙ্খের জপমালা এখনো রয়েছে এই পরিবারে।মহাশঙ্খের জপমালার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কাহিনী অনেকটা এরকম--কোনো এক অমাবস্যার রাতে এক চন্ডালিনির অপঘাতে মৃত্যু হয়।তার মাথার খুলির টুকরো দিয়ে নির্মিত হয় ওই মালা এবং তার নাড়ি ব্যবহৃত হয় ওই মালা গাঁথার সুতো হিসাবে।রামচন্দ্র ভট্টাচার্য এই মালা দিয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করতেন বলে জানা যায়।কথিত,কালীপুজোর রাতে নাকি জেগে ওঠে মহাশঙ্খের জপমালা;গভীর রাতে বিশেষ আরাধনা হয় এই মালার।তখন কারণবারিতে ভিজিয়ে রাখা হয় এই মালা,শোনা যায় যত কারণবারিই ঢালা হোক না কেন-তা সঙ্গে সঙ্গে শুষে নেয় এটি।ন'বাড়ির পুজোর কিছু বিশেষত্ব আছে।শুদ্ধ তন্ত্রমতে রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রচলিত বিশেষ কিছু নিয়মের মাধ্যমে এই পুজো সম্পন্ন হয়।বাইরের পুরোহিত নয়,বরং বংশপরম্পরায় বাড়ির ছেলেরাই পুজো করে থাকেন।এই বাড়ির ঠাকুর অত্যন্ত জাগ্রত বলে মানা হয়,বহু দূর দূর থেকেও মানুষজন আসেন মনের বাসনা

নিয়ে মানত করতে।মনস্কামনা পূরণ হলে দেবীর জন্য তারা একটি অথবা দুটি পাঁঠা উৎসর্গ করেন নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে কালীপূজার ওই বিশেষ দিনে।

বেলপুকুরের অন্যতম একটি প্রাচীন পুজো সিদ্ধেশ্বরীতলার সিদ্ধেশ্বরী কালীর পুজো। শোনা যায় এই সিদ্ধেশ্বরী তলার নামকরণের পিছনেও অবদান রয়েছে রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের।এই স্থানের পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন বলে জানা যায়।এখানকার মূর্তি আগে প্রস্তরনির্মিত ছিল,কিন্তু কিছু ব্যাঘাত ঘটায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে মূর্তিটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কৃষ্ণনগরে।এরপর থেকে পুজোর দিনেই মূর্তি গড়ে পুজোর রীতি প্রচলিত সিদ্ধেশ্বরীতলায়।

দীপান্বিতা অমাবস্যার রাতে নিজগৃহে দেবী কালিকার আরাধনাকে আবশ্যক বলে মনে করেন এই গ্রামের প্রতিটি বাসিন্দা।প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই এই দিন চলে কালিকার আবাহন।বিশুদ্ধ তন্ত্রমতে,বহু উপাচারে পুজোই এই গ্রামের বিশেষত্ব।এমন কিছু নিয়ম প্রচলিত আছে এখানে যা অন্য কোথাও দেখা যায়না।গ্রামের পালবাড়িতে বংশপরম্পরায় পুরো গ্রামের প্রতিটি বাড়ির মূর্তি নির্মিত হয়। যে পাটা বা কাঠের পাটাতনের উপর মূর্তি নির্মিত হয় তা এক একটি বহু বছরের পুরোনো।কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার পরেরদিন পালবাড়িতে পাটা(কাঠের পাটাতন, যার উপরে মূর্তি নির্মিত হয়) পাঠানো হয়ে থাকে। পুজোর আগেরদিন দিনের আলো থাকতে থাকতে ঠাকুরকে ঘরে নিয়ে আসার নিয়ম রয়েছে।পুজোর আগেরদিন দুপুরে চোদ্দ শাক খাওয়া হয় এবং চোদ্দ প্রদীপ জ্বালানো হয় বাড়িতে।পুজোর দিন ভোরবেলা আলো ফোটার আগে যারা যারা উপবাস করবেন,তারা ফল-মিষ্টান্ন সহযোগে আহার সম্পন্ন করেন।আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যিনি ঢাকি ঢাকে আগমনীর তাল বাজিয়ে থাকেন। বলা হয় মাকে ঘুম থেকে তোলা হচ্ছে।এরপর সারাদিন ধরে চলে পূজার আয়োজন।বেলার দিকে ঠাকুর সাজাতে আসেন মালাকার পরিবারের শিল্পীরা।এরাও বংশপরম্পরায় করে আসছেন এই কাজ।শোলার সাজ তৈরী করা থেকে অস্ত্র,পুরোটাই এরা বানান।অধিকাংশ বাড়িতেই ডাকের সাজ প্রচলিত থাকলেও কোনো কোনো বাড়িতে শাড়ি পরানোর চলও রয়েছে।এইদিন কালীপুজোর সঙ্গে দীপান্বিতা লক্ষ্মীপুজোও হয়।কুনকেতে ধান রেখে তার চারদিকে চারটি গাছকৌটো অথবা প্যাঁচার দারুমূর্তি সজ্জিত করে লক্ষ্মীরূপে পুজো করা হয়।দুপুরের সময়ে বাড়ির কোনো একজন পুরুষ সদস্য গিয়ে নারায়ণ নিয়ে আসেন।বিকেলে পঞ্জিকাতে দেওয়া সূর্যাস্তের সময়ে ঘড়ি ধরে দেবীকে পাটে তোলা হয়

অর্থাৎ বিশেষ পূজার স্থানের শুদ্ধ জলচৌকির উপরে স্থাপনা করা হয়।ব্রাহ্মণবাড়ির ক্ষেত্রে যে কোনো দুজন পুরুষ,যাদের উপনয়ন হয়ে গেছে তারা এটি করেন।আর অব্রাহ্মণ বাড়ির ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরা এই কাজটি করে থাকেন।কাঁকড়ামাটির দলার উপরে স্থাপিত হয় ঘট।সন্ধ্যে থেকে ভোররাত পর্যন্ত চলে পুজো। তন্ত্রানুসারে পুজো হয়ে থাকে।কোথাও কোথাও মাকে মদ্য নিবেদন করা হয়।প্রায় ৮০% বাড়িতে এখনো বলিপ্রথার প্রচলন রয়েছে।ছাগবলির সঙ্গে সঙ্গে চালকুমড়ো,কুমড়ো বা আখবলিও প্রচলিত আছে।বলির মাংস পরেরদিন রন্ধন করে মহাপ্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

ভোগের ক্ষেত্রে এমন কিছু পদ সহযোগে দেবীকে আবাহন করা হয় যা অন্য কোনো স্থানে দেখা যায় না।মোটামুটি প্রত্যেকটি বাড়িতেই একই ধরনের ভোগ নিবেদিত হয়।খিচুড়ি,পাঁচ কিংবা সাত বা নয় রকমের ভাজা,চিংড়ি মাছ বা মাছের মাথা দিয়ে পুঁইশাকের চচ্চড়ি,সাদা ভাত,মুগ ডাল,এঁচোড়ের ডালনা।গমনী বলে এক বিশেষ ধরনের পদ রান্না করা হয়,যার মধ্যে বিভিন্ন রকম সবজি পড়ে এবং প্রত্যেকটি সবজি কাটতে হয় আঙুলের এক করের মাপে।এছাড়া হয় মেটে আলু দিয়ে মাছের ঝোল,ফুলকপির ডালনা,জলপাইয়ের চাটনি,পায়েস,কলার বড়া,নারকোল নাড়ু।এছাড়াও নৈবেদ্য,অংকুরিত মোটর এবং ছোলা (যেটিকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ভিজেন),ফলফলাদি,দই এবং মিষ্টি দেওয়া হয়।লক্ষ্মীকে ভোগ দেওয়া হয় লুচি,নারকোলের নাড়ু,নৈবেদ্য এবং ফল।কিছু কায়স্থ গৃহে অন্নভোগ দেওয়া হয়না।সেখানে লুচি ভোগের প্রচলন রয়েছে।

পূজার পরেরদিন সকালে নারায়ণের পূজার পরে তাকে আবার যে বাড়িতে তিনি নিত্য সেবনের জন্য থাকেন,সেখানে ফেরত দিয়ে আসা হয়।দুপুরে মাছভাত খেয়ে বাড়ির বউয়েরা এবং বিবাহিত মেয়েরা ঠাকুরকে বরণ করেন। নাড়ু,খিলি করা পান মায়ের হাতে দিয়ে,পান দিয়ে মুখ মুছিয়ে বাড়ির সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলা বরণ করেন। এরপর মায়ের সিঁথিতে এবং শাঁখায় সিঁদুর ছুঁইয়ে মঙ্গলকামনা করে তিনি মায়ের কানে কানে বলেন-"আসছে বছর আবার আসিস মা!"এরপর চলে সিঁদুরখেলা।সিঁদুরখেলার শেষে ঘট থেকে জল ছেটাতে ছেটাতে বরণডালা এবং শঙ্খ হাতে নিয়ে দেবীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন বাড়ির মহিলারা।এরপর অলঙ্কারসমূহ মায়ের গা থেকে খুলে রেখে যাত্রা করা হয় বিসর্জনের উদ্দেশ্যে।আগে মাথায় করে নিয়ে গিয়ে বিসর্জনের রীতি থাকলেও বর্তমানে বারোয়ারি পুজোগুলির ক্ষেত্রে সাং এবং বাড়ির পুজোগুলির ক্ষেত্রে ভ্যান করে নিয়ে গিয়েই বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনেরও একটি নির্দিষ্ট রীতি

রয়েছে।ঘড়ি ধরে সূর্যাস্তের সময়ের ঠিক একই সময়ে সময় মিলিয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়।বিসর্জনের শেষে পাটা নিয়ে আসা হয় বাড়ি,আবার অপেক্ষা শুরু হয় পরের বছরের জন্যে।

এখন সময় বদলেছে,অন্ধকার রাতে মশালের আলোয় গুরুগম্ভীর ঢাকের বোল আর মন্ত্রোচ্চারণের আওয়াজের স্থান দখল করেছে প্রযুক্তি এবং আধুনিকতা।তবুও ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টায় ব্রতী এই গ্রামের বংশানুক্রমিক উপাসকেরা।একই নিয়ম বজায় রেখে,একই ভাবে পুজো চালিয়ে যাচ্ছেন সকলে।অনেক বাড়ির পুজো হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে আবার কেউ নিজের শেষ সামর্থ্যটুকু দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন পুজো।গ্রামে স্থায়ীভাবে না থাকলেও,চাকরির সূত্রে বিদেশে থাকলেও বছরের এই সময়টা প্রবাসীরা ফেরত আসেন তাদের শিকড়ের কাছে।সারাবছরের বেঁচে থাকার রসদ নিয়ে আবার শুরু করেন গতানুগতিক জীবন পুজোর শেষে।চাকচিক্য আর মানুষের ভিড় থেকে বহুদূরে এই গ্রাম নীরবে করে চলেছে তার চারশো বছরের পুরোনো ঐতিহ্যের সযত্ন লালন।শুধু অমলিন সাক্ষী হয়ে বয়ে চলেছে জলঙ্গী,আদি থেকে এখনও।

- ঋণস্বীকার :-

১. শৈবাল সরকার , (Edt.) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও সমকাল, মুদ্রা, ২০১৯, পৃষ্ঠা, ২৬৩

২. কুমুদনাথ মল্লিক, নাদিয়া কাহিনী, তৃতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা - ২৮৩

3. মোহা জাহাঙ্গীর হোসেন, অবিভক্ত নদীয়া জেলা ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি, গতিধারা, ২০০৯, পৃষ্ঠা, ১৭৭

১। শ্রী অনির্বাণ ভট্টাচার্য

বয়স-৫৫

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ -২৩/০১/২০২২

ঠিকানা-নতুনপল্লী,কৃষ্ণনগর,নদীয়া

২। শ্রী বিশ্ববিজয় ভট্টাচার্য

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-২৭/০১/২০২২

ঠিকানা-মুহুরীপাড়া,বেলপুকুর,নদীয়া।

৩। শ্রী শুভ ভট্টাচার্য্য

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ -২৮/০১/২০২২

ঠিকানা-মুহুরীপাড়া,বেলপুকুর,নদীয়া।